অধ্যায় - ০২

প্রাক মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান

প্রাক্ মঙ্গলকাব্যের যুগে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা আলোচনার পূর্বে একটি কবিতার দ্বারস্থ হতেই হচ্ছে। কবিতায় পাই-

''যখন প্রথম শুরু হল চাষ চারণভূমি ছেড়ে
তখন থেকেই তোমার মাঝে দেখছি বদল হতে
কঠিন জীবন সহজ হলো, গণমানুষের ভীড়ে
মাঠ ঘাট নদী দূর প্রান্তরে তোমায় হল না যেতে
তুমি হয়ে গেলে কামনার শিখা অবলা এক নারী
এই ছোট গৃহ বেছে নিলে তুমি সারা বিশ্ব ছাড়ি।''[১]

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী ছিল পুরুষের মত পরিশ্রমী। তারা ছিল পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্রই পুরুষের সাথী। তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত রাত জেগে গৃহ-গুহার পাহারায় লিপ্ত থাকত, তেমনি মাঠে-প্রান্তরে পুরুষের ছিল সহকর্মী। সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী ছিল অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারিণী। অনেকে মনে করেন নারী-ই চাষবাসের আরম্ভ ও চাষ উপকরণের স্রষ্টা। সে সময় নারীই ছিল সন্তানের একমাত্র স্বীকৃত অভিভাবক।

মঙ্গোলীয় জাতিরা এদেশে আসার পর নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি। কারণ হিসেবে মঙ্গোলিয়রাও ছিল মাতৃতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা এদেশে আসার পরও মায়েদের দেবীর অধিকার থেকে বিচ্যুত করেনি। এদেশে আর্যরা আসার পর থেকে একটু একটু করে মায়েদের আসন খর্ব হতে থাকে। কিন্তু তবুও দেখা যায় যে, সে সময়েও আদিবাসীরা উপাস্য দেবতার চেয়ে দেবীর আরাধনার বেশী প্রাধান্য ছিল। তাই তো আজও শিবের চেয়ে দেবী মা দূর্গার পূজা বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব হিসেবে গন্য।

উপনষদীয় যুগে নারীর অধিকার তেমন ভাবে ক্ষুন্ন হয়নি।

''এমনকি, বহুচারিণী হওয়া নারীর জন্য ধর্মবিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, সমাজে নিন্দনীয়ও ছিল না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐতরেয় উপনিষদের রচয়িতা ছিলেন ঐতরেয় মহীদাস। ঐতরেয় নামটি এসেছে তাঁর মাতা ইতরা থেকে। ইতরার স্বামী ছিলেন একজন

বিশিষ্ট ঋষি। ইতরা তার স্বামীর সংশ্রব ছাড়াই গর্ভবতী হয়ে মহীদাসের জন্ম দেন। এজন্য মহীদাস মাতার নাম অনুসারে ঐতরেয় মহীদাস নামেই পরিচিত হন। এজন্য তাঁর মাতা ইতরা বা মহীদাস নিজে সমাজে নিন্দনীয় ছিলেন না।''[২]

আবার দেখা যায় বৃহদারণ্য উপনিষদের শেষে যে ছত্রিশজন ঋষির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা সকলেই তাঁদের মায়ের নামে পরিচিত। যেমন পৌতিমাষীপুত্র, কাত্যয়নীপুত্র, গৌতমীপুত্র, ভারদ্বাজীপুত্র, পরাশরীপুত্র, কৌশিকীপুত্র প্রমুখ। অতএব আর্যসমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও উপনিষদের কাল পর্যন্ত আর্যসমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার রেশ বেঁচে ছিল। এরপর

> ''খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টোত্তর শতকের মধ্যে সমাজে নারীর অবস্থানে অনেক পরিবর্তন হয়। *** *** ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে নারী-প্রাধান্য ও প্রধান পূজারিণীর আসন অটুট ছিল। পরবর্তী ৮০০ বছরের ভিতর নারীর অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হতে নারীপ্রাধান্য লুপ্ত হয়ে খ্রিস্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের মধ্যে নারী সম্পূর্ণভাবে ভোগের ও বিলাসিতার সঙ্গিনীতে পরিণত হয়। এভাবেই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে এদেশে গণিকাবৃত্তির প্রসার ঘটে। অবশ্য বর্ণ হিসেবে নির্ধারিত হয় নারীর অবস্থান, কিন্তু মর্যাদা কোনো সময়ই আর ফিরে আসেনি। তবে নিম্নবর্ণের লোকেদের কাছে নারী তখনও মর্যাদাবান যা এখনও বর্তমান আছে।''[৩]

নর-নারীর মধুময় মিলন-মিশ্রণে মধুময় জগতের সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকৌশলের তারতম্যের জন্য নারী-জীবনের রুদ্ধতা, হতাশাময়তা, গ্লানিময়তা, অসহায়তা, অন্ধকারময়তা ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যা আজও সত্য বলেই বিবেচিত। পুরুষের তুলনায় নারীর সাহস, বল, ক্ষমতা, অধিকার, প্রয়োগ-কুশলতা প্রখর এবং প্রকট নয়। পুরুষের প্রখর-প্রকটত্বের কাছে নারী চিরকালের মত আজও ''রুদ্ধ, ভাষাহীন, নির্জীব, অসহায়, ক্রন্দনরতা, শান্ত, শ্রী'র প্রতীকস্বরূপ।''[৪] বিচিত্র এই বঙ্গভূমির বাংলাভাষার সৃষ্টির অনেককাল আগে থেকেই সাহিত্য রচনার পরিচয় মেলে। সংস্কৃতে পাওয়া যায় তিন ধরণের সাহিত্য- বড় কাব্য বা মহাকাব্য জাতীয় রচনা, নাটক, প্রকীর্ণ শ্লোক বা চুটকি কবিতা। এর মধ্যে উল্লখযোগ্য অভিনন্দের 'রামচরিত কাব্য', অষ্টম শতকে মহাভারতের কাহিনি নিয়ে লেখা ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' এবং একাদশ শতকের মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘ রাঘব' এছাড়া পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত সাগর নন্দীর সঙ্কলিত 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' ইত্যাদি। F.W.Thomas ১২০০ সালের পূর্বে প্রকীর্ণ কবিতার সঙ্কলন সম্পাদনা করে নাম দেন 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। এই চুটকি

২ প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান

জাতীয় কবিতাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। শ্রীধর দাসের এই গ্রন্থখানির সঙ্কলনের সমাপ্তিকাল ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী/মার্চ। সংস্কৃতে সেভাবে গেয় পদের শ্লোকের নিদর্শন না মিললেও জয়দেবের ১০০ বছরের পূর্বে কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার চরিত্রে' এবং রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি স্বয়ং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ কিছু সাক্ষাৎ মেলে। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকের অবহট্ঠ অপভ্রংশে লেখা 'প্রাকৃত পৈঙ্গল', পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতির অবহট্ঠে লেখা 'কীর্তিলতা'য় অনেকগুলি গান ও কবিতার সন্ধান মেলে। এই সময় রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মুসলমান সেখ ফকিরের আগমন ঘটে। এই ফকিরকে নিয়ে নানা ধরণের গাল-গপ্প কাহিনি নিয়ে ষোড়শ শতকের শেষার্ধে 'সেখ শুভোদয়া' নামে একখানি বই লেখা হয়েছিল। এর ভাষা ভাঙ্গা সংস্কৃত হলেও এখানে কয়েকটি বাংলায় ছড়া ও গান আছে। তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে এই গ্রন্থের মূল্য নিতান্ত কম নয়। আমরা জানি গুপ্ত যুগের পূর্বে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান শুধুমাত্র প্রত্নলিপি এবং ভূমিদানের পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রত্যেকের মত আমরা সাধারণত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি।

১) প্রাক্-তুর্কি আক্রমণ যুগ- আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। এই যুগকে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন 'হিন্দুবৌদ্ধ যুগ', যদুনাথ সরকার বলেছেন- 'হিন্দুযুগ' বা (Hindu Period) আর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন 'প্রাচীন হিন্দু যুগ'।

২) তুর্কি আক্রমণোত্তর যুগ- আনুমানিক ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ।

৩) য়ুরোপ প্রভাবিত যুগ- আনুমানিক ১৮০১ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।[৫]

প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান কী রকম ছিল তা জানতে হলে বিশেষ করে তুর্কি আগমনের পূর্বে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। আমরা জানি বৈদিক যুগে বা মহাভারতের যুগে নারী কিছুটা হলেও ছিল স্বাধীন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা প্রাচীন হিন্দুযুগের নারীদের ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়েছিল, হয়তো এর পিছনে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কিছু কিছু কারণ আছে, তবুও একথাও সত্য যে প্রাচীন হিন্দু আমলের রমণীরা অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণ-যুগের নারীরা সমাজে ও সংসারে যেটুকু স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করেছিলেন, তার সবটুকুই তুর্কি-আক্রমণোত্তর বাংলাদেশে নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল। তাই প্রাচীন হিন্দু আমলে বিদগ্ধ কবিদের কাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, অবহট্ঠ কবিতা, রাজপ্রশস্তি, শিলালিপি, এমন কি ধর্মমত সম্বন্ধীয় কাব্য কবিতা সর্বত্রই নারীদের নিয়ে মাতামাতি ও তাদের স্তুতি। কারণ প্রাচীন হিন্দুযুগে লোকধর্ম ও রাজধর্ম সর্বত্রই যাগের চেয়ে যোগ,

২ প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান

আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে হৃদয়ানুকুল্য, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেয়ে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাসময় আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়েছিল। বিশেষভাবে মানব স্বভাবের পক্ষে সহজ অনুকূল ছিল বলেই এই ধরনের জীবনাচরণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাই সে-সময়ের জয়দেবের পদাবলীতে হরিস্মরণাকাঙ্ক্ষার লোকোত্তর আকূতির সঙ্গে পরিণয়বদ্ধ করেছে বিলাসকলা কুতূহলের লোকায়ত জীবন বাসনা।

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, প্রতিদিনের অশনবসন বিলাসব্যসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি যে আমাদের মননকল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে অর্থাৎ এগুলো যে আমাদের মানস প্রকৃতির ও সংস্কৃতির পরিচায়ক এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। কিন্তু কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন কল্পনা ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা, প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম শিল্পকলা জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, জীবনের প্রাত্যহিক কর্মব্যবহার, জীবনচর্যার মধ্যেও তা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ চর্যা বা আচরণও বটে। এক হিসেবে চর্যা যা আচরণ চর্চাকে সার্থকতা দান করে, দু'য়ের মিলনেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

প্রাচীন হিন্দুযুগে চলমান মানবপ্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেউ ধরে রাখেনি, তাই উপাদানের অভাব দেখা যায়। তবু তথ্যগত ইতিহাস কিছু কিছু আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আছে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র বিশেষভাবে বিলাসব্যসন ও কামচর্চার এবং বাংলার নগর সভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য সমন্বিত গ্রন্থ। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে। বাংলার সুবিস্তৃত স্মৃতিগ্রন্থদ্বয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃত পৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য ও নানা গ্রন্থে বাংলার সমসাময়িক জীবনের তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়েছে। এইসব গ্রন্থ অধিকাংশ দশম থেকে দ্বাদশ/ত্রয়োদশের মধ্যে লেখা।

বাৎস্যায়ন তাঁর কামশাস্ত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী এবং কোমলাঙ্গী বলেছেন- 'মৃদুভাষিণ্যোহরাগবত্যোমৃদ্বঙ্গ্যশ্চগৌড়াঃ' কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির মধ্যে প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি পাই না। কারণ নগরবাসিনী ও পল্লীবাসিনী এই দুই শ্রেণিদ্বন্দ্বের মধ্যে আবর্তিত হয়ে বর্তমানের মতন সেকালেও নারীজীবনের মধ্যে পরিবেশগত, অবস্থাগত, দেহগত সর্বোপরি মনোগত কিছু কিছু পার্থক্য বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নগরবাসিনী নারী বলতে প্রধানতঃ রাজ অন্তঃপুরের পুরনারীগণ,

২ প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান

নগরবাসিনী বা পণ্যা স্ত্রীলোকগণকেই বোঝায়। এছাড়া উচ্চকোটি বিত্তবান সমাজের নারীদেরও নগরবাসিনী বলা চলে।

প্রাচীন হিন্দুযুগে নারীদের যে অবস্থানের চিত্র পাওয়া যায় তাকে লিপিবদ্ধ করা যায় এভাবে-

''১. প্রাচীন যুগের অর্থাৎ হিন্দুযুগের রাজাদের তাম্রশাসন লিপিতে পিতার নামের সঙ্গে 'মাতা' ও 'স্ত্রী' (রাণী) দের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এতে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়, এটা নিঃসন্দেহে নারীজীবনের প্রাধান্য সুচিত করে।

২. রাজ-অন্তঃপুরের নারীরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের সুবিধা পেতেন। মহিষীরা নিজেদের ইচ্ছামত মঠ-মন্দির স্থাপন, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রামদান ইত্যাদির স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ধর্ম নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কোন বিবাদ ছিল না।

৩. 'দেবদাসী' ও নটীপণ্যাদের নিয়ে অর্থাৎ তাদের রূপ-গুণ বেশবাস-সাজসজ্জা ইত্যাদি নিয়ে কবি সাহিত্যিকরা কাব্য রচনা করতেন। সে-যুগে অর্থাৎ হিন্দুযুগে নারীদের প্রাধান্য এর মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়।

৪. সেযুগে অর্থাৎ হিন্দুযুগে নৃত্যরতা মহিলা (জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী) এবং সঙ্গীতে পারদর্শিনী মহিলার (বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী গায়িকা ও জনৈকা বণিকবধূর সঙ্গীতপ্রিয়তা) পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুযুগে স্বাধীনভাবে নারীরা রাজসভায় সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করতেন।

৫. হিন্দুযুগে নারীরা বেশবাসের ক্ষেত্রে আধুনিক ও সৌখীন ছিলেন। উচ্চকোটী সমাজের নারীরা এবং কলাবতী নটীরা শাড়ি ছাড়াও আঁট পাজামা, ওড়না, কাঁচুলি, জাঙ্গিয়া (চলন) এবং সাজসজ্জার ক্ষেত্রে চোখে কাজল, কর্পূর, ঠোঁটে লাক্ষারস, খোঁপায় ফুল, মৃগনাভি ব্যবহার করতেন।

৬. নারীদের মধ্যে বেশি না হলেও কখনও কখনও অসবর্ণ বিবাহ হত। এবং পরবর্তীকালে তাদের সন্তানসন্ততিরা সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করতেন।

৭. হিন্দুযুগের উচ্চকোটী স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখতেন। পবনদূত কাব্যে তাদের প্রেমপত্র রচনার উল্লেখ আছে। পল্লীবাসিনী নারীরা হিসাব-নিকাশের কাজ জানতেন।

৮. হিন্দুযুগের নারীরা স্বাধীনভাবে খেলাধুলা; যেমন- জলক্রীড়া, উদ্যান রচনা ইত্যাদি করতেন।

৯. সেযুগে অর্থাৎ হিন্দুযুগে পুরুষের একটি স্ত্রী গ্রহণ করারই রীতি ছিল। তবে পুরুষের বহু বিবাহের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের চিত্র পাওয়া যায়।

১০. সে-যুগে হিন্দুযুগে নারীর শিরোনামে নাটকের নামকরণ; যেমন- বীণামতী, কলাবতী, 'পদ্মাবতীর পরিণয়' ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। এতে নারীর প্রাধান্যই সূচিত হয়।

১১. কোন কোন রাজকার্যে রাজ্ঞীর অনুমোদন প্রয়োজন হতো। হিন্দুযুগে এটা নিঃসন্দেহে অর্থবহ ইঙ্গিত।

১২. গৃহস্থ ও গরীব ঘরের মেয়েরা গৃহকর্মাদির সঙ্গে সঙ্গে মাঠে গিয়ে খাটত এবং সংসারনির্বাহের জন্য হাটবাজারে গিয়ে সওদা ও কেনাবেচা করত। এটা সে-যুগে নারী-স্বাধীনতা।

১৩. হিন্দুযুগে কোন কোন রমণী স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতেন। শিশুধাত্রীর কাজ, গৃহে সুতোকাটা ও তাঁতবোনা, পাটনীর কাজ, ইত্যাদি জীবিকাকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এতে স্বামীর উপার্জনেও সহায়তা করা হত।

১৪. হিন্দুসমাজে নিম্নস্তরে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত ছিল না।

১৫. হিন্দু যুগের নারীরা ছিলেন সর্বতোভাবে স্বাধীন। বিশেষ করে গৃহস্থ ও দরিদ্র ঘরের মেয়েদের 'অবরোধ' প্রথা একেবারে ছিল না বললে ভুল বলা হবে না। তবে উচ্চকোটী বা রাজঅন্তঃপুরের নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথা ছিল।''[৬]

সেন বংশের রাজাদের তাম্রশাসনে পালরাজাদের মতন বিস্তৃতভাবে সামন্ত, অমাত্য প্রভৃতির নাম আছে এমন তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু বৈশিষ্ট্য হল সেন রাজাদের এই তালিকায় রাণীদের নাম আছে। এই যুগের রাজ্যশাসনে রাণীর হয়তো বিশেষ ক্ষমতা ছিল।- এই যুগে রাজ্যশাসন বিষয়ে রাণীর কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল কিনা, অথবা বাংলার বাইরে থেকে আগত এই সমুদয় রাজবংশের আদিম বাসস্থানে রাণীর বিশেষ কোন অধিকার ছিল বলেই তাঁরা বাংলায় এই নতুন প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন কিনা তা বলা কঠিন।'[৭] পাল এবং সেন বংশের তালিকাক্রমকে প্রথমে তুলে ধরা যাক। পাল রাজা-রাজদের তালিকা এরকম-

২ প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান

ক্রমিক নং	রাজার নাম	জানা রাজত্বকাল	রাজ্যলাভের আ. অব্দ
১	গোপাল	****	৭৫০
২	ধর্মপাল	৩২	৭৭০
৩	দেবপাল	৩৯/৩৫	৮০৫
৪	শূরপাল	৫	৮৪৫
৫	(?)বিগ্রহ পাল (১ম)	১	৮৫৩
	(ক) নারায়ণ পাল	৫৪	৮৫৪
৬	রাজ্যপাল	৩২	৯০৮
৭	গোপাল (২য়)	১৭	৯৪০
৮	বিগ্রহ পাল (২য়)	২৬ (?)	৯৬০
৯	মহীপাল	৪৮	৯৮৮
১০	নয়পাল	১৫	১০৩৮
১১	বিগ্রহপাল (৩য়)	১৭	১০৫৪
১২	মহীপাল (২য়)	****	১০৭২
১৩	শূরপাল (২য়)	****	১০৭৫
১৪	রামপাল	৫৩	১০৭৭
১৫	কুমারপাল	****	১১৩০
১৬	গোপাল (৩য়)	****	১১৪০
১৭	মণদপাল	১৮	১১৪৪

[৮]

ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী সেন বংশীয় রাজ-রাজাদের শাসনকাল নিম্নরূপ-

সামন্ত সেন	
হেমন্ত সেন	
বিজয় সেন	আ. ১০৯৭ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ
বল্লাল সেন	আ. ১১৬০ থেকে ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মণ সেন	আ. ১১৭৮ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ
বিশ্বরূপ সেন	আ. ১২০৬ থেকে ১২২০ খ্রিস্টাব্দ
কেশব সেন	আ. ১২২০ থেকে ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ

[৯]

২ প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান

প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান কী রকম ছিল তা জানতে হলে বিশেষ করে তুর্কি আগমনের পূর্বে নারীর অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর বলতে হয়, প্রাক্ মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্য হিসেবে বিবেচ্য চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য। চর্যাপদে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে হলে বলা ভাল নারীর স্বাধিকার সম্পর্কে তারা ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। বাংলার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'। এখানে দেখি অভাব-অনটনের মধ্যে নারীরা আপন স্বভাব স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাভাবিক। চর্যাপদের সময়কালে সমাজের অপাংক্তেয় ব্রাত্য নারীরা উঠে এল সাহিত্যের পাতায়। কাব্য ফসলের পাত্র-পাত্রীরা হল ডোমনী, শুন্ডিনী, চন্ডালী, শবর-শবরী, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণিভুক্ত। জাতি-বর্ণ ভেদানুসারে ব্রাহ্মণরা এদের ছোঁয় না। ডোম্বী বা ডোমনারী, শবর-শবরী, নিষাদ প্রভৃতিরা আদিম সমাজের জনগোষ্ঠী। এরা আর্য সমাজ বহির্ভূত। সমাজের অন্ত্যেবাসী নারী হলেও তারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করত। এর-ই জন্য তারা কখনো করছে খেয়া পারাপার, গরিব মেয়েরা বিক্রি করছে চোলাই মদ, এমনকি নৃত্য-গীতি করে তারা অতি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করত।

চর্যাপদের সময়ে দারিদ্র্য বুঝি ছিল নিত্যসঙ্গী। দরিদ্র-সমাজের চিত্রকে কবিরা ফুটিয়ে তুলতে কখনও পিছুপা হননি। মনে পড়ে-

''উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গিপীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। ধ্রু।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী*গুহাডা।
তোহৌরি ণিঅ ঘরিণি ণামে সহজ সুন্দারী।।''[১০]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থানুসারে বলতে হয়-

> ''উচ্চ উচ্চ পর্বত, সেইখানে বালিকা শবরী বাস করেন। শবরীর পরিধান ময়ূরপুচ্ছ, গ্রীবাতে গুঞ্জামালা উন্মত্ত শবর! পাগল শবর! গুহায় লীন করিও না। সহজসুন্দরী নামে আমি তোমার নিজ গৃহিণী, তোমারই গুহায় বিচরণ করিতেছি। প্রধান তরু নানাপ্রকারে মুকুলিত হইল, ডালসকল গগনেতে লাগিল। শবরী কর্ণে, কুন্ডল বজ্র ধারণ করিয়া, এই বনে একাকিনী ক্রীড়া করিতেছেন। শবর তিন ধাতুকে খাট করিয়া পাতিলেন এবং সেই মহাসুখরূপ খাটে শয্যা বিছাইলেন। ভুজঙ্গ শবর দারী নৈরাত্মার সহিত প্রেমলীলারসে রাত্রি পোহাইলেন। হৃদয়কে তাম্বুল করিয়া, মহাসুখকে কর্পূররূপে ভক্ষণ করিলেন। এবং শূন্য নিরামণিকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহাইলেন। গুরুবাক্যকে ধনু করিয়া, নিজ মনকে বাণ করিয়া, এক শরসন্ধানে

পরম নির্ব্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। গুরুতর রোষে উন্মত্ত হইয়া শবর গিরিবরশিখরের সন্ধিদেশে প্রবেশ করিলেন। শবর কিরূপে লড়িঘেন?''[১১]

সমাজের নিম্নবর্ণের নারীরা খেয়া পারাপার করত। চর্যাগীতিতে দেখা পেলে একজন পাটনী খেয়া পারাপার করছে। এই নিম্ন বৃত্তির নারীরা তাদের নিজ সংসারের জন্য নিজেরাই তীর ধনুক-খড়গ্ ব্যবহার করত। নিজেরা জীব-জন্তু শিকার করে বীরের মত রাস্তা দিয়ে চলে আসত ঘরে। এখানে দেখা যায়, নারীরা নিজে মদ তৈরি করে তা বিক্রি করছে। ডোমেরা তাঁত তৈরি, চাঙ্গারী বোনা ও নৌকা পারাপার করে। সুন্দরী-রূপসী এক ডোমিনীকে দেখে কাহ্নপাদের হৃদয়ে দোলা লেগেছে। কাহ্নপাদ তাকে ভোগ করার জন্য ধাবমান হয়েছেন। চৌষট্টিটি পদ্মের উপর নৃত্যরতা ডোমিনীর প্রেমে কাহ্নপাদ কাপালী যোগীর নগ্নবেশ ধারণ করেছেন। চর্যাপদের মধ্যে যতই অন্তর্নিহিত বাক্যালাপ থাকুক না কেন, তা একেবারে সাধারণ মানব-মানবীর তীব্র আসক্তিপূর্ণ জীবনের ছবি বলেই মনে হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি-কবির কণ্ঠস্বরে গোষ্ঠীজীবনের কথা ফুটে উঠেছে। এই গোষ্ঠী জীবনের কথায় কবিদের শৈল্পিক সত্তায় নারীর কণ্ঠে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, হৃদয়স্পর্শী আকুতির পরিচয় পাওয়া যায়। এযুগের পরিপূর্ণ মানবী চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা, এবং বিদ্যাপতি, চন্ডীদাসের রাধা। এ রাধা সহজ। এ রাধা সরল। এ রাধা বালিকা নববধূ। এ রাধা নিত্য দিনের গৃহ কর্মে নিপুণা। গৃহকর্ম-ই এর একমাত্র ব্রত, এতেই তার সুখ, এতেই তার শান্তি। এর মধ্যে নেই কোন ছল-চাতুরী। কিন্তু হঠাৎ একদিন পুরুষ-সমাজের কর্ণধার অর্থাৎ কৃষ্ণের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ল তার দিকে। আর যায় কোথায়? তাকে আর তাঁর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হল না। বলা যায় কৃষ্ণের কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে করেছে দেহদান। কিন্তু তার প্রাথমিক নারী সত্তাকে রক্ষা করেছে স্বামী ও সমাজের দোহাই দিয়ে।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের আদি কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। লেখক বড়ু চন্ডীদাস। কাব্যখানি কবে লেখা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য। তবে মোটামুটি সকলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে চতুর্দশ শতকের বলে দাবি করেছেন। কাব্যখানি জয়দেবের গীতগোবিন্দের সার্থক অনুসরণ। জয়দেবের অনুসৃত কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তবুও এর মধ্যে রয়েছে কবি চন্ডীদাসের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল সুর দেহাতীত আধিদৈবিক প্রেমসাধনার সুর, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মাটির পৃথিবীর কাব্য। কাব্যের মূল চরিত্র রাধা এবং কৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণিত হয়েছে এখানে। এ রাধা রক্ত-মাংসে গঠিতা। মানুষের দেহপ্রাণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-নিরাশা, বাসনা-কামনা, আকুতি ও

আবেগ এ সকলের একটা স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য ও মর্যাদা আছে। রাধাচরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃত মানুষের সাধারণ দেহবোধের পরিচয় রেখেছেন। প্রবৃত্তি ও তার পরিণতির চিত্র আছে এ কাব্যে।[১২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর বন্দি-দশার পরিচয় মেলে। নারীরা আ-জীবন যে বন্দি-দশার মধ্যে দিনাতিপাত করত তার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। নারীর স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা, শিক্ষা, প্রেম, বিবাহ সর্বোপরি নারী-মনের আশা-আকাঙ্খা কোনকিছুকেই পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজ মেনে নেয়নি। নারী আ-জীবন সমাজের বিধি-বিধানের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত।

> ''সমাজের বিধি বিধানের শৃঙ্খলার নিগড় যা নারীজীবনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল অক্টোপাশের মত, তারই চাপে পড়ে রাধা নাম্নী একটি বালিকা যে কিনা সেকালের নারীধর্মের সামাজিক প্রতিরূপ, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হয়ে বুকফাটা আর্তনাদ ব্যক্ত-করেছে চিরকাল, চোখের জলে মধ্যযুগের মাটিকে সিক্ত করেছে।''[১৩]

বাংলাদেশে বাল্য-বিবাহ বহু প্রচলিত বিষয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার যখন এগার বছর বয়স, তার অনেক আগে থেকে রাধা আইহনের ঘরণী। আইহন নপুংসক। কাব্যে এলেন কৃষ্ণ। আর রাধার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তনুলীলা। ''এই কাব্য রাধার বাল্য হইতে যৌবনোন্মেষে জাগরণের কাব্য।''[১৪] নপুংসক স্বামী অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রী রাধার রূপের মোহে পাগল-হারা হয়ে যাতে পুরুষ-সমাজ রাধাকে ভোগ করতে না পারে তাই তত্ত্বাবধায়করূপে রাধার মাতামহী বড়াইকে সঙ্গিনী করে দিল। তৎকালীন গোপ সমাজের প্রতিভূ রাধা মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রি করে। সঙ্গে থাকে সখীরা, গোপরমণীরা আর প্রহরী বৃদ্ধা বড়াই। তাই স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার ক্ষমতা নেই রাধার। অপরদিকে শাশুড়ী-ননদী মিলে সব সময় রাধাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। ফলে কুলবধূ রাধার মর্মন্তুদ যৌবন-কান্নার আর্ত-রোল সকলকে বিস্মিত করে তোলে। যদিও রাধা কৃষ্ণের পৌরুষে মুগ্ধ, তবুও সমাজের সতীত্ববোধ তাকে প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য পিছু টান দিয়েছে। কিন্তু

> ''এ-রাধা দুরন্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা কিশোরী, গর্বিতা যুবতি। কৃষ্ণের দেবত্বে ইহার বিশ্বাস নাই, পরকীয়া প্রেমের মহত্ত্বে এ সন্দিগ্ধা। এ হাসিয়া রাগিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, মারিয়া ধরিয়া, ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া, কথার মুখেমুখে তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়া সমস্তক্ষণ পাঠকের মর্মকে টানিয়া রাখে; এবং কাব্যের শেষে বিরহব্যথার নিভৃত খিলান-পথে কখন অজ্ঞাতসারে একেবারে মনের মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ করে। এ-মূর্তি এতই সজীব প্রাণ-প্রচুর যে, মনে হয় তাহার পায়ে কাঁটাটি বিঁধিলে এখনই রক্ত বাহির হইবে। এই রক্তের অধিকারই সাহিত্যের অধিকার; সে-

স্বাভাবিক অধিকারে রাধা শ্রীকষ্ণকীর্তন-এর নায়িকা এবং রাধার অধিকারে কাব্যখানি নানা দোষ সত্ত্বেও অমূল্য।''[১৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা হিন্দু-ঘরের কুলবধূ। হিন্দুদের দেহ-মনে সতীত্ববোধ সদা জাগ্রত। রাধার মনে সতীত্ব বিরাজমান। এই সতীত্ব-ই বাঙালি মেয়ের চিরকালের সম্পদ। তাই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরবর্তী ফসল মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, বেহুলা তার সতীত্বের জোরে স্বামী সহ ছয় ভাসুরের প্রাণ এবং শ্বশুরের হারানো সম্পদ সব ফিরে পেয়েছিল। রাধাকে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী করতে কবিকে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে। তাম্বুলখন্ড, দানখন্ড, নৌকাখন্ড, ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, বৃন্দাবনখন্ড, কালিয়াদমন খন্ড, যমুনা-হার-বাণখন্ডের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কবি এসে পৌঁছলেন বংশীখন্ডে। এখানে এসে দেখা যায়, রাধা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছে না। এই খন্ডে রাধার প্রেমের পরিণতি ঘটেছে। কৃষ্ণ যখন কাছে ছিল, তখন রাধা তাঁকে করেছে উপেক্ষা। আজ কৃষ্ণ কাছে নেই, আছে তাঁর শুধু বাঁশির সুর। এই সুর রাধাকে উন্মাদিনী করে-

> ''একদিন যে-ভবিষ্যৎকে সে অবজ্ঞা করিয়াছিল, সেই ভবিষ্যতের দিকে, সেই অনন্তের দিকে তাহার চিত্তকে অভিসারে বাহির করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের দেহ তাহাকে তৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু এই গীতিমূর্তির আহ্বানে তাহার দেহের পালঙ্কের উপরে বিরহিণীর বিমুগ্ধ চিত্ত জাগিয়া উঠিল; জাগিয়া উঠিয়া বিরহের শূন্য পটে স্মৃতির জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়া-আঁকিয়া দেখিতে লাগিল। এবারে রাধার দেহমাত্র নয়, মন ভুলিয়াছে, কৃষ্ণের রূপে নয় কৃষ্ণের স্বরূপে। কে বলে চাঁদ চন্দন-সুশীতল! কে ইতিপূর্বে জানিত যে নবকিশলয়ে দগ্ধ করে! আজ কানু বিনা যে দশদিক তাহার নিকট শূন্য, আজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একমাত্র বাঁশি ধ্বনিত!''[১৬]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা এবার বিরহের অনল আগুনে পুড়ে ছারখার। কিন্তু এ রাধার মধ্যে আবার খুঁজে পেলাম ছল-চাতুরীপনা। কৃষ্ণ বিহনে রাধা নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে বসল। এবার কৃষ্ণকে ধরা দিতেই হল।

বিরহখন্ডে রাধার আর হাসি নেই, রাগ নেই, পুলকে-পুলকিত হয় না তার মন। কৃষ্ণের চিন্তায় রাধা বিভোর। আজ শয়নে-সপনে শুধু কৃষ্ণকে দেখছে। কৃষ্ণ-সন্ধানে রাধা যাবে বৃন্দাবনে। পথের নানা বিপত্তিকে হেলায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একদিন যে রাধা কৃষ্ণকে উপেক্ষা করেছিল, আজ সেই রাধা তার সেই উপেক্ষার জন্য নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিচ্ছে। কৃষ্ণের দেবত্বকে রাধা ব্যঙ্গ করলেও আজ সে অনুধাবন করেছে কৃষ্ণের দেবত্বের মহিমাকে। বসন্তের আগমনি-ধ্বনিতে রাধার মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, কারণ রাধার কাছে যে কৃষ্ণ অনুপস্থিত। রাধা আজ কখনো ঈর্ষায়, কখনো মূর্ছায়

বিকল হয়ে পড়েছে। এ রাধা একেবারে মানবী রাধা, দেবী নয়। বিরহ খন্ডে রাধার যে আর্তি তার প্রায় সবটুকু ভোগবিরতি জনিত হতাশা। রাধা তার ভোগ-লিপ্সাকে চরিতার্থ করার জন্য কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল নয়নে পথ চেয়ে আছে। তার কাতরোক্তির মধ্যে একেবারে ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। আজ সমাজের অঙ্গুলি হেলনকে রাধা তোয়াক্কা করে না।

''একদিন যে বালিকাটি দুই চক্ষে অগ্নি লইয়া অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল- সেই নীতিবিগর্হিত প্রেমের জন্য দুই চক্ষুতে অশ্রু কুলাইল না, সমস্ত হৃদয় ভরিয়া শ্রাবণ নামিল। এই সম্পূর্ণ পৃথক দুই প্রান্তের যোগসূত্র রচনা করিয়াছে বড়ু চন্ডীদাসের অনুপম কবিপ্রতিভা।''[১৭]

মধ্যযুগের কাব্যাকাশের একটি বড় শাখা হল বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান বিষয় হল রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা। এই প্রণয় কাহিনি প্রত্যেক বৈষ্ণব কবি খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রাক্ মঙ্গলকাব্যের বৈষ্ণব পদাবলীর দু'জন বিখ্যাত কবি হলেন বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাস। বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রেম-মহিমার উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে।

বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্যযুগের সু-প্রসিদ্ধ কবি। তিনি রাজসভার কবি। তাঁর সৃষ্টির পরিধি বৃহৎ বনস্পতির মত। আর তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালির প্রাণের সম্পদ। বাঙালির আত্মার আত্মীয় বিদ্যাপতি। জয়দেবের সহজ-সরল সংস্কৃত ভাষা যেমন বাঙালির কাছে সহজ আস্বাদ্য ছিল তেমনি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলী ছিল আস্বাদনীয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা আজও বাঙালির গৃহ-সম্পদ। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে বিরহ পর্যন্ত অবাধ বিস্তার। শিল্পী বিদ্যাপতির সন্তর্পণ তুলির আঁচড়ে তাঁর রাধার দেহমনের অর্ধ-বিকচ রূপটি দলে দলে উদ্ভিন্ন হয়ে শতদলের ন্যায় বিকশিত। শৈশব ও যৌবনের মধ্যবেলায় নারীর শরীরে-মনে যে বিপুল আলোড়নের গতিবেগ পরিলক্ষিত হয় তাকে বিদ্যাপতি রূপদক্ষের মত রূপ দিয়েছেন। এ রাধা চঞ্চলা, কী চায়, কী ভাবে তা দুর্বোধ্য।

''কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয় অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।।''[১৮]

রাধার এই চাঞ্চল্য জানিয়ে দেয় সে যুবতী হতে চলেছে।-

''খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরঈ।।

খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস।।''[১৯]

যৌন-চেতনার প্রথম ঊষা-লগ্নকেও কবি বিদ্যাপতি বাসতব রেখায় এঁকেছেন।

''নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি।।''[২০]

রতি কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কান পাতে সতর্কে-

''সুনইতে রসকথা থাপয়ে চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত।।''[২১]

বিদ্যাপতির রাধার এই বয়ঃসন্ধিকালের কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> ''রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে।-
> ---বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য, সতৃষ্ণ লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।--হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায় কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল ও অভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপন নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।''[২২]

আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাধার কৈশোর চলে যাচ্ছে, যৌবন দ্বার উপস্থিত হচ্ছে এমতাবস্থায় বিদ্যাপতির রাধার বর্ণনায় পাই-

> ''বাল্যকাল চলিয়া যাইতেছে, যৌবন আসিতেছে, মদন দুজনকেই পথ দেখাইয়া দিতেছে- একজনকে বলিতেছে 'যাও'। আর একজনকে বলিতেছে 'এস'। এতদিন মাজাটা মোটা ছিল, সে ক্ষীণ হইয়া আসিল। নিতম্ব দুটী শুকনা ছিল, সে দুটি মোটা হইল। আগে খুব হো হো করিয়া হাসিত। এখন সেটী মুচ্‌কে হাসিতে দাঁড়াইল। আগে স্তনের চিহ্নমাত্র ছিল, এখন সেটি প্রকাশিত হইয়া উঠিল। এতদিন চরণ চঞ্চল ছিল খুব ছোটাছুটি করিত, এখন সেটি বন্ধ হইয়া গিয়া চঞ্চলগতি চক্ষে উঠিল।''[২৩]

বিদাপতির রাধার একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিশোরী রাধার বয়ঃসন্ধিকালের চিত্তচাঞ্চল্য থেকে কৃষ্ণ বিরহিনী হয়ে কৃষ্ণের কাছে সমর্পিতায় তার পরিণতি। সৌন্দর্যে ঢল ঢল যুবতী রাধার কালিন্দী নদী কুলে কৃষ্ণের সাক্ষাতে অনুরাগের সঞ্চার হয়। কৃষ্ণও মুগ্ধ প্রেমিক। কৃষ্ণের দিকে তাকাতে লজ্জা তবুও না তাকিয়ে পারছে না রাধা।

‘‘অবনত আনন কএ হাম রহলিহুঁ।
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনু সে চাঁদ চকোর।’’[২৪]

এ প্রেম তো আর বৈধ প্রেম নয়, এ সমাজ গর্হিত প্রেম। সমাজের ভ্রুকুটি রয়েছে রাধার উপর। কারণ রাধা পরস্ত্রী, কৃষ্ণ পরপুরুষ। কিন্তু প্রেমের গতি তো দুর্বার। কোন বাধা-বিঘ্ন তো রাধার প্রেমকে বিচলিত করতে পারে না।

‘‘নব অনুরাগিণি রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা।।
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান।।’’[২৫]

রাধার মনে সংশয় উপস্থিত হয় যখন প্রকৃতি এবং পথ দুইই বিরূপ প্রতিকূলতায় গতি-পথ রুদ্র করে দেয়। কিন্তু প্রেম তো শত আঘাতেও পরাজয় স্বীকার করতে পারে না। তাই অঝোর বারি-বর্ষণের মধ্য দিয়ে রাধা চলেছে অভিসার-

‘‘বরিষ পয়োধর ধরণী বারিভর
রয়ণী মহাভয় ভীমা।
তইও চললি ধনী তুয় গুণ মনে গণি
তসু সাহস নাহি সীমা।।’’[২৬]

‘‘দুঃখের বিপর্যস্ততার মধ্যেই প্রেম তপস্যার রূপ নেয়। এখানেই বিদ্যাপতির দেহী রাধার মধ্যে অধ্যাত্মশ্রীর প্রথমস্ফুরণ।’’[২৭]

মিলনের পদে বিদ্যাপতি রাজাধিরাজ। মিলনের পদে বিদ্যাপতি রাজসিক আভিজাত্য দেখিয়েছেন। মিলন পর্বের পদে যেন রসোৎসবের স্রোতস্বিনী বহমান।

‘‘অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে।।’’[২৮]

অথবা-

''কিঙ্কিনী কিনিকিনি কঙ্কন কন কন
কলরব নূপুর বাজে।
নিজমদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ভিন্ডিম রাজে।।''[২৯]

অভিসারের পর যে মিলন সমাচ্ছন্ন সে মিলনের মধ্যেও যেন তৃপ্তি নেই। রাধার মনে কি এক বেদনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে।

''লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।''[৩০]

মিলনের মাঝে এই যে অতৃপ্তি তা তো কামনারই বহির্প্রকাশ। এই অতৃপ্তির জন্য মিলন মাঝে বিরহ-বেদনা অনুরণিত হয়। কিন্তু যখন সম্ভোগের পর বিরহের যাতনা এসে উপস্থিত হল তখন বিদ্যাপতি নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। আজ যখন বিরহের যাতনা-পর্ব শুরু হল তখন রাধার মত বিদ্যাপতি শুধুই বিপুল শূন্যতা দেখছেন।-

''অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল।।
*** *** ***
সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দসদিস সূন ভেল সগরী।।''[৩১]

বিদ্যাপতি রাধাচিত্তের সঙ্গে মানব-মনের প্রকৃতির সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর সংযোগ গড়ে তুলেছেন-

''এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।''[৩২]

এখন উপেক্ষিত রাধার হৃদয় শুধু ধুলায় লুণ্ঠিত। জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তে রাধার কাছে দেহ-ভোগই সর্বেসর্বা ছিল আজ তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

''পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল জৈছে মালতিমালা।।''[৩৩]

বিরহের দুঃসহ যাতনার মুহূর্ত গুলি যখন বুকের উপর পাষাণের মত চেপে থাকে তখন বেদনাময় দিন রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়-

''কি কহসি কি পুছসি সূন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।।
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিআ সঙ্গ দুখ হাম পাস।।''[৩৪]

বিদ্যাপতির বিরহের পদগুলির মধ্যে শাস্ত্রকথিত শিল্পকলাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে ভক্তি এবং প্রেমের গানে মাতোয়ারা হয়েছেন বিদ্যাপতি। রাধিকার সেই প্রতিবাদিনী রূপের পরিচয় এখানে মেলে না। এখানে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে সমর্পিতা। বিদ্যাপতির উপমা এবং কবিতার শরীরে যে সৌন্দর্য্য তা আজ রাধার চোখের জলে ভিজে নব-লাবণ্যরূপ ধারণ করেছে।

''চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা।।''[৩৫]

বিদ্যাপতি সব সময় আলোর দিকে ধাবমান একথা বললে ভুল হবে। কারণ-

> ''তাঁহার কাব্যে কেবলই আলো বলিলে অবিচার করা হয়। কোন কবিই নিছক আলোর কবি হইয়া বড় হইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির কাব্যে আলো এবং ছায়ার মাঝামাঝি এক অসীম রহস্যের ধূসরতা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। আজীবন তিনি শিল্পরীতির চর্চা করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের জবানীতে মানবহৃদয়ই।''[৩৬]

বিদ্যাপতির একটি পদ ভাবের গাঢ়তায় ও গভীরতায় অনন্য সৃষ্টির পদ মর্যাদায় ভূষিত।

''সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।''[৩৭]

এই পদটিতে

> ‘‘মানবজীবনের অনন্ত রহস্য- অনন্ত ট্রাজেডী ও আনন্দ যেভাবে রূপ ধরিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর্টসাধনা সার্থক হইয়া গেছে। বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় না থাকিলেও বলিতে পারি- সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও তাহার অব্যর্থ প্রকাশের বাণী মানবপ্রাণ চিনিয়া লয়ই- এই পদটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কাব্য।’’[৩৮]

ভাবসম্মিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকার বিদ্যাপতি। আমরা জানি বিরহ যদি আধ্যাত্মিকতায় দীপ্ত হয়ে ওঠে তবেই আসে ভাবসম্মিলন। এবার রাধার ধ্যানলোকে দয়িত কৃষ্ণের আলোকিত আবির্ভাব। বাইরে আজ যে কৃষ্ণ অধরা হৃদয়ের পাদপদ্মে তাকে চিরকালের প্রাপ্তির মধ্যে ধরার নামই ভাবোল্লাস।

> ‘‘এই মনোমিলনেই চিত্তের পরিপূর্ণতম উন্মীলন। বিরহ-বিচ্ছেদহীন তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ-সুন্দর মন তখন প্রশান্ত বিভায় উজ্জ্বল। চিত্ত-স্থৈর্যের সেই অপরূপ অভিব্যক্তি হল ‘দশদিশ ভেল নিরদন্দা।’ এবার আর যন্ত্রণার মিথ্যা মায়ায় হৃদয়ের ছিন্নভিন্নতা নয়, অকারণ রক্তক্ষরণ নয়। কেবলই প্রাপ্তির স্বস্তিতে নিরঙ্কুশ উল্লাস।’’[৩৯]

বিদ্যাপতি ভাবোল্লাসকে মুক্তি দিলেন এভাবে-

‘‘আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা।
*** *** ***
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা।।’’[৪০]

এই পর্যায়ে তাঁর বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পদের সন্ধান মেলে ‘পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে, মঙ্গল যতহুঁ করব নিজদেহে’, ‘কি কহব রে সখি আনন্দ ওর’ ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলিতে এক নতুন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে একমাত্র কবি বিদ্যাপতি কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতায় বশবর্তী হননি। এই পদ গুলিতে কাতরতামূলক নতি স্বীকার এবং আত্ম-সমর্পণের চেয়ে আত্মনিবেদনের খুশিতে উৎফুল্লা। তাঁর বিখ্যাত পদ গুলি হল-

‘‘জতন জতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরনক বেরি হেরি কোঈ ন পুছত
করম সঙ্গ চলি জায়।।
এ হরি বন্দোঁ তুআ পদ নায়।

তুআ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কৌন উপায়।।''[৪১]

অথবা-

''মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলিঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।।''[৪২]

অথবা

''তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণি সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।।''[৪৩]

-এই পদগুলি যেন রাধার মত কবি বিদ্যাপতির আত্ম-জীবনালেখ্য। এখানে কবির ব্যক্তি এবং তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার ছায়াপাত ঘটেছে।

''হয়তো সম্ভোগ-বিতৃষ্ণ পরিণত-আয়ুর রাজকবির ব্যক্তি-চিত্তের মর্মমন্থনেই এই পদগুলির জন্ম।''[৪৪]

চন্ডীদাসের রাধা: চন্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকার। তাঁর পদ হৃদয়ের কথা বলে। অলংকারহীন ভাষায় চন্ডীদাস যেভাবে হৃদয়ের মর্মব্যথাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তা বৈষ্ণব পদাবলী কেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি বেদনার কবি। বেদনাই চন্ডীদাসের বাণী-সাধনা। পূর্বরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকার চন্ডীদাস। পূর্বরাগের রাগিণী বেদনার বৈরাগ্য-রাগিণীতে বাঁধা। পূর্বরাগ থেকে শুরু করে ভাবসম্মিলন অব্দি চন্ডীদাসের রাধার অশ্রু-বারি ঝরে পড়েছে। তাঁর কবিতায় হৃদয়ভেদী সরলতা এবং অনুভূতির সুরধ্বনি সহজ-সরল। চন্ডীদাস রূপের কবি নন, ভাবের কবি। তিনি ভাব-সাধনার সাধক। জীবনসাধনার বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর রাধা অলৌকিক আলোক সাধনায় নিজেই উন্মোচিত হয়ে উঠেছে। এ রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণ-প্রেমে প্রৌঢ়া, কৃষ্ণ-প্রেমে আত্ম-হারা।

কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী রাধা কৃষ্ণ নাম শ্রবণ মাত্রই সে নাম জপ করতে করতে-

''না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।''[৪৫]

এই সময় থেকেই রাধা হয়ে উঠেছে যোগিনী। 'মহা যোগিনীর' মত আহারে তার মন নেই। এখানে রাধার শান্ত-শ্রী ধ্যান-মূর্তি ফুটে উঠেছে।-

''সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।।''[৪৬]

রাধার অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে। রাধা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য চঞ্চলময়ী, সে নিজেকে এক জায়গায় স্থির রাখতে পারছে না। তাই-

''ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়।।''[৪৭]

চন্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগে অনুরাগিণী হয়ে আজ বড় নিঃসঙ্গ, দুঃসহ মর্মব্যথা হৃদয়ের গভীরে গেঁথে গিয়েছে।

''কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত।।''[৪৮]

কৃষ্ণকে পেয়ে রাধার অনুরাগ এত তীব্রতর যে, 'আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।' চন্ডীদাসের রাধা প্রথম থেকেই প্রেমময়ী। কারণ চন্ডীদাস প্রেমের কবি। প্রেমে পাগলিনী রাধা আজ-

''গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি।।''[৪৯]

রূপানুরাগ পর্যায়ের দু'একটি উল্লেখযোগ্য পদ পাওয়া যায় চন্ডীদাসের। কিন্তু এগুলি গোবিন্দ দাস কিংবা জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদের মত নয়। চন্ডীদাসের রূপানুরাগের মধ্যেও যেন বেদনা-বন্যার

কলতান ধ্বনি শোনা যায়। রসোদ্গার এবং প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ গভীর প্রেম-স্মৃতির বেদনার ছায়ায় মলিন।-

''এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।।
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও।।''[৫০]

মিলনের বিহ্বলে যেন আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে রাধিকার মন উৎকণ্ঠিত।

''দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।''[৫১]

অভিসারের পদে দেখা যায়, ঘনঘোর রজনীতে রাধা যথাসময়ে অভিসারে আসতে না পারার জন্য তার হৃদয় শতধায় বিভক্ত হয়েছে যখন দেখে-

''এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বধুঁয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।''[৫২]

বাসক সজ্জিকা এবং উৎকণ্ঠিতার পদ-রচনায় চন্ডীদাস যথার্থ কৃতী কবি। খণ্ডিতাপর্যায়ে রাধাকে প্রগল্ভার ভূমিকায় দেখা যায়। রাধা মধ্যযুগীয় সমাজ-বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে যেভাবে তার প্রেমিকের দর্শনকে আত্মদৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেছে তাতে নিঃসন্দেহে সে যুগের কেন এযুগে দাঁড়িয়ে বলা দুষ্কর।

''ভাল হৈল ওহে বন্ধু আইলে সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে।।''[৫৩]

অথবা-

''ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধূ অইখানে থাক।
মুকুর লৈয়া চাঁদ মুখখানি দেখ।।
নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভাল।।''[৫৪]

অথবা

নীল কমল ঝামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পায়া রসনিধি
নিঙাড়ি লয়েছে সেহ।।''[৫৫]

অথবা-

''কপোলে সিঁদুর রেখা অধরে কাজল।
সো ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছলছল।।''[৫৬]

কৃষ্ণের প্রতি এই যে রোষ তা আক্ষেপের পর্যায়ে এসে বিলীন হয়ে গেছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধা যে ব্যবহার করেছে তাতে আজ রাধা নিজেই ব্যথিত। তাই রাধার মনে আক্ষেপের অন্ত নেই। কারণ রাধা সমাজ সম্পর্কে জ্ঞাত। রাধা তো জানে পুরুষের বহু-নারী সম্ভোগের অধিকার রয়েছে, তাই কিছু পূর্বে তার প্রেমিককে যে ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে ছিল এখন সেই ধিক্কারের জন্য নিজেই অনুতপ্ত। তারই জন্য রাধা বলেছে-

''সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না বুঝিয়া যদি করেছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ।।''[৫৭]

এই পর্যায়ে রাধা বেদনার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত। প্রেমিক দয়িতের নিষ্ঠুর উদাসীনতা রাধার কাছে কাম্য ছিল না। এখানে রাধার আত্ম-অসংযমের ব্যর্থতার রক্তমাখা পদে পাই-

''যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে।।''[৫৮]

প্রেমের জ্বালায় ব্যথিত রাধা যখন কৃষ্ণ নাম ভুলতে চায় তখন তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। গভীর বেদনায় সিক্তা রাধিকা বলতে লাগে-

''এ-ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।।''[৫৯]

কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা রাধাকে মৃত্যুরই অভীমুখে চালিত করেছে।

''কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।''[৬০]

রাধা তার প্রিয়তমকে পাওয়ার জন্য-

''ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।।''[৬১]

কৃষ্ণপ্রেমে রাধা নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে রাধা যদি দেখে কৃষ্ণ তাকে উপেক্ষা করে অন্য কোন গোপিনীর কাছে যাতায়াত করছে, তখন তার হৃদয়-বিদারক অনুযোগ ধ্বনিত হওয়ারই কথা-

''সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।।''[৬২]

নারী-জীবনের এই কঠিন বেদনার দিনেও প্রিয়তমের বিরুদ্ধে রাধা অভিযোগের তীব্র-বাণ নিক্ষেপ না করে বরং মৃদু স্বরে বলেছে-

''সখি কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কাঁদিতে জীবন গেল।।''[৬৩]

আবার কখনও বুক ভাঙ্গা কান্নার রোল ধ্বনিত হয়-

''সখি এ-বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতির কথা।।''[৬৪]

আজ রাধা বুঝতে পেরেছে প্রণয়ের পরিণতি কেবলই দুঃখময়-

''পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া যতনে খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে।।

হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মৈলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জরজর
বাউলি হৈয়া গেলুঁ।।''[৬৫]

রাধার আক্ষেপের অন্ত নেই। কারণ এই কৃষ্ণই তো একদিন তার প্রতি পরমানুরাগের পরিচয় দিয়েছিল-

''চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর।।''[৬৬]

তাই রাধা নিজে অবশেষে 'অল্প বয়েসে পিরিতি করিয়া'ছে বলে তাকে যে ঘর ছাড়িয়েছে তারই সম্মুখে নিজের মৃত্যুর কামনা করেছে-

''বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।''[৬৭]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> ''বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চন্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চন্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চন্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চন্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও অনুরাগ।''[৬৮]

তাই কৃষ্ণ যখন বহুদিন পরে রাধার কাছে ফিরে এসেছে, তখন বিরহিনী রাধা তাঁর বিহনে কেমন করে দিন গুলি কাটিয়েছিল, তারই বর্ণনা দিয়েছে-

'' বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে।।
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।।
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভালো।।

এসব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি।।
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে।।
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান।।''[৬৯]

প্রেম সাধনার নামে রাধা দুঃখের তপস্যায় মগ্না। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> ''আমাদের চন্ডীদাস সহজ ভাবের কবি, এইগুণে তিনি বাঙ্গালার সকল প্রাচীন কবিদের শ্রেষ্ঠ। তিনিই বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহাদেরই জন্য কবি। তাঁহার অলিখিত কবিতাই অধিক। তিনি যেখানে দশছত্র লিখিয়াছেন, সেখানে একশ ছত্র লিখিয়াছেন। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।''[৭০]

চন্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলে জেনেছেন। আর তাঁর কল্পিতা রাধা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী যে উক্তি গুলি করেছে তা নিখিল প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত প্রণয়লীলার সঙ্গীতে ভরপুর। চন্ডীদাসের রাধার তিন ভুবনে নিজের বলতে আর কেউ নেই, তাই রাধা অনুভব করেছে 'ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর'। তার কাছে প্রিয়তমের জন্য গঞ্জনা ভোগ কিছু নয়-

''কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।''[৭১]

চন্ডীদাসের রাধা তো জানে,

'সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।'[৭২]

শেষ পর্যন্ত রাধা স্থির করেছে, এ-জন্মে যেহেতু আর কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না, তাই তার শেষ আর্তি-

'মরিয়া হইব শ্রীনন্দনের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা।'[৭৩]

চন্ডীদাসের রাধা সত্যই সাধিকা। এ রাধা কৃষ্ণময়ী-কৃষ্ণগতা-তনুমনপ্রাণা। ত্যাগের দেদীপ্যমান দ্যুতিতে এই রাধার মুখ দিয়ে চন্ডীদাস প্রেম সম্পর্কে যে শেষ কথা শুনিয়েছেন-

২ প্রাক্ মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান

''চন্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।।''[১৪]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। রহমান, মোঃ শহিদূর: সনাতন প্রেমের কবিতা, পৃ-৩০

২। রহমান, মো: শহীদুর: আদি বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, পৃ-৩২৯

৩। তদেব, পৃ-৩৩০-৩৩১

৪। মুখোপাধ্যায়, ড. সুতপা: বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারী সমাজ- প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, প্রস্তাবনা, পৃ- [ix]

৫। চৌধুরী, ভূদেব: বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ-২৮

৬। মুখোপাধ্যায়, ড. সুতপা: বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারী সমাজ, পগ্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ- ১৩-১৪-১৫

৭। মজুমদার, রমেশচন্দ্র: বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১ম খন্ড-পৃ-১২০-১২১

৮। তদেব, পৃ-১২০-১২১

৯। সুর, অতুল: বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পৃ- ৫

১০। শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ: হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬, চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৮৮, পৃ- ৪৭

১১। তদেব, পৃ- ৪৮

১২। বসু, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ: মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: রাধাচরিত্র, জেনারেল, কলকাতা-১৫, অক্টোবর, ২০০৯, পৃ-৪১-৫৬

১৩। মুখোপাধ্যায়, ড. সুতপা: বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারী সমাজ, পগ্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ-২২

১৪। বিশী, প্রমথনাথ: বাংলা সাহিত্যের নরনারী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা-২০, ২০শে মে ২০০১, পৃ- ১

১৫। তদেব, পৃ- ১

১৬। তদেব, পৃ- ৩

১৭। বসু, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ: মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: রাধাচরিত্র, জেনারেল, কলকাতা-১৫, অক্টোবর, ২০০৯, পৃ-৫৭

১৮। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-১১২

১৯। তদেব- পৃ-১১৩

২০। তদেব- পৃ-১১২

২১। তদেব- পৃ-১১৩

২২। http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15458-500

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ: বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে, বিদ্যাপতি: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ মে ২০০৬, পৃ-১৪৭

২৪। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-৮১

২৫। http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/handle/10689/21338

২৬। http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/handle/10689/21338

২৭। তদেব- পৃ-১১৪

২৮। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-১২৩

২৯। http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/handle/10689/21338

৩০। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-১৪৭

৩১। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-১৩৬

৩২। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২৭১

৩৩। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-১৩৫

৩৪। তদেব- পৃ-১৩৫

৩৫। তদেব- পৃ-১৩৫

৩৬। বসু, শ্রীশঙ্করী প্রসাদ: মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল, কলকাতা-১৫, অক্টোবর, ২০০৯, পৃ-৩১

৩৭। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-১৪৭

৩৮। বসু, শ্রীশঙ্করী প্রসাদ: মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল, কলকাতা-১৫, অক্টোবর, ২০০৯, পৃ-৩১

৩৯। সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ: বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার, ফার্মা কেএলএন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ-১১৮

৪০। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-১০৯

৪১। তদেব- পৃ-১১১

৪২। তদেব- পৃ-১১১

৪৩। তদেব- পৃ-১১০

৪৪। সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ: বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার, ফার্মা কেএলএন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ-১১৯

৪৫। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-১৩২-৩৩

৪৬। তদেব- পৃ-১৩২

৪৭। তদেব- পৃ-১৩১

৪৮। তদেব- পৃ-১৪৬

৪৯। তদেব- পৃ-১৪৬

৫০। সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ: বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার, ফার্মা কেএলএন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ-১২২

৫১। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-১৪১

৫২। তদেব- পৃ-১৮৭

৫৩। সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ: বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার, ফার্মা কেএলএন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ-১২৩

৫৪। তদেব- ১২৩

৫৫। তদেব- ১২৩

৫৬। তদেব- ১২৩

৫৭। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-৫৯

৫৮। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২২৬

৫৯। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২২৬-২৭

৬০। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২২২

৬১। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২২২

৬২। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-৫৬

৬৩। সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ: বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার, ফার্মা কেএলএন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ-১২৫

৬৪। তদেব- ১২৫

৬৫। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ: বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-৬৫

৬৬। http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15458-500

৬৭। সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ: বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার, ফার্মা কেএলএন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ-১২৬

৬৮। http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15458-500

৬৯। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২৯৪

৭০। http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15458-500

৭১। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২৫৪

৭২। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২২৯

৭৩। চট্টোপাধ্যায়, অশোক: বৈষ্ণব পদাবলী, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯, পৃ-২২৪

৭৪। http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15458-500